ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, April, 2026, Page No. 218-224
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.452

দেবসেবা ও জনকল্যাণে বর্ধমানের রানী ও রাজকুমারীগণের কৃতিত্ব- একটি পর্যালোচনা

লায়লা নাজনিন, *স্বাধীন গবেষক, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 05.04.2026; Accepted: 09.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This paper discusses the role of Burdwan Royal Family's Queens and Princess in "Divine Service and Public Welfare". They played vital roles in administration, religious deeds, social welfare and political spheres. People still remember Rani Brajakishori Devi, Rani Bishankumari Devi, Rani Radharani Devi, Rani Kamalkumari Devi, Princess Satyabati and others with deep respect These Queens managed Burdwan Zamindari administration with great efficiency. They participated various religious institutions, temples and public welfare. Not only royal inner quarters, they played significant roles in society and state. They established examples of leadership by overcoming the social barriers of their times. They also played important roles in the expansion of education, service of poor and public welfare programmes. So, Queens and Princess of Burdwan Royal Family will remain for ever in our hearts.

Keywords: Empowerment of women, religious deeds, social welfare, Women's leadership, Zamindari administration

ভারতবর্ষের এক ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান হলো বর্ধমান। আর এই বর্ধমানের রাজপরিবারের কথা ইতিহাসের পাতায় সমুজ্জ্বল। বর্ধমান রাজপরিবার শুধু রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ক্ষমতার জন্যই নয়, তাদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অবদানের জন্যও বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই রাজপরিবারের রাজারা যেমন তাঁদের পরাক্রমশালী কীর্তি ও জনকল্যাণমূলক কাজের কারণে স্মরণীয় হয়ে আছেন, তেমনি এই রাজপরিবারের রাণী ও রাজকুমারীগণ সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা ও জনকল্যাণমূলক কাজে ও সাহসিকতায় অসামান্য ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁদের কার্যকলাপ প্রমাণ করে যে, অন্তঃপুরে সীমাবদ্ধ থেকেও তাঁরা কেবল গৃহস্থালী জীবনের মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন না; বরং প্রশাসনিক দক্ষতা, দূরদৃষ্টি, সাহসিকতা, আত্মবিশ্বাস, মানবকল্যাণের মানসিকতা দিয়ে সমাজ জীবনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। রাজকুমারী সত্যবতী যেমন নিজের বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার জোরে শোভা সিং-কে হত্যা করেন। তেমনি রাণী ব্রজকিশোরী দেবী, রাণী বিষণকুমারী দেবী, রাণী রাধারাণী মহাতাব বুদ্ধি, সাহসিকতা ও নিজ সিদ্ধান্তে অবিচল থেকে বর্ধমান রাজপরিবারকে অনেক বিপদ হতে রক্ষা করেন ও তার সাথে দেবসেবা এবং জনকল্যাণে নানাবিধ কাজ করেন। রাজপরিবারের এই নারীরা তাঁদের কীর্তি ও দৃষ্টান্তমূলক নেতৃত্বের মাধ্যমে বর্ধমাানের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছেন। কেউ জমিদারীর প্রশাসন দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেছেন, আবার কেউ স্বামীর অবর্তমানে পুত্রের অভিভাবিকা হয়ে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়ে বর্ধমান

রাজপরিবারকে এক উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। রানীদের বুদ্ধিমত্তার নিকট ব্রিটিশরাও নতি স্বীকার করেছে। আবার কোনো রাণী ও রাজকুমারী ধর্মীয় স্থাপত্য নির্মাণের মাধ্যমে সমাজে স্থায়ী ছাপ রেখে গেছেন। তাঁদের নির্মিত মন্দির স্থাপত্য জনমানসে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। আবার এই রাজপরিবারের কোনো রাণী আধুনিক যুগে রাজনীতির মঞ্চে এসে জনসেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন।

এই প্রবন্ধে বর্ধমান রাজপরিবারের রাণীদের ও রাজকুমারীদের জীবন, কর্ম এবং তাঁদের সামাজিক-ধর্মীয় অবদান বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন তাঁদের ব্যক্তিগত গুণাবলী ও নেতৃত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি অন্যদিকে বাংলার সামগ্রিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ দিকও উদ্ভাসিত হয়।

রাণী ব্রজকিশোরী দেবী-রাজা জগৎরাম রায়ের স্ত্রী ও রাজা কীর্তিচাঁদ রায়ের মাতা ছিলেন ব্রজকিশোরী দেবী। তিনি ছিলেন তেজস্বী, ধর্মপ্রাণ মহিলা। তিনি রাজকার্যের বিভিন্ন কার্যে অংশ গ্রহণ করতেন ও অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার সাথে সমস্যার সমাধান করতেন।

> "রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় বর্ধমান জমিদারীর অধীন ভুরশুট পরগণার ইজারাদার ছিলেন। বিষয় সংক্রান্ত ব্যাপারে নরেন্দ্রনারায়ণ রায়, ব্রজকিশোরীর প্রতি দুর্ব্যবহার ও অশালীন কথাবার্তা ও অন্যায় আচরণ করেন। তাতে ব্রজকিশোরী ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি অধিকার করে তাঁকে সর্বস্বান্ত করেন। নরেন্দ্রনারায়ণ রায় বাধ্য হয়ে শ্বশুরবাড়ী নওয়াপাড়া গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে অবশ্য দেব সেবার জন্য কিছু জমি-জায়গা দান করেন ও কিছু ভূ-সম্পত্তি ইজারা হিসাবে দেন।"[১]

এর থেকে বোঝা যায় যে রাণী ব্রজকিশোরী খুবই তেজস্বী নারী ছিলেন। কোনো অন্যায়ের সাথে তিনি যেমন আপোষ করেন নি, তেমনি একজন ধার্মিক নারী হিসাবে দেবসেবাও তিনি করেছেন। নরেন্দ্রনারায়ণ তাঁকে অপমান করলে তিনি তাঁকে যথোপযুক্ত শাস্তি দেন। কিন্তু দেব সেবার জন্য নরেন্দ্রনারায়ণকে বেশ কিছু জমি-জায়গা দান ও ভূসম্পত্তি ইজারা দেন। এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে, ধর্মীয় উদারতার সাথে তাঁর মধ্যে বিচক্ষণতা ও মহানুভবতাও ছিল।

রাণী ব্রজকিশোরী কর্তৃক নির্মিত মন্দির ও ঘাট সমূহ-

"১৭০৯ খ্রী: (১৬৩০ শকাব্দ) সাধারণ মানুষের জলকষ্ট দূর করার জন্য শহরের পূর্বাঞ্চলে একটি বড়ো সরোবর কাটিয়ে দেন এবং দক্ষিণ দিকে বিরাট চত্বর সহ ঘাট বাঁধিয়ে দেন। পূর্বদিকেও বাঁধানো ঘাট নির্মাণ করান। দক্ষিণদিকের ঘাটে একটি শিলালিপিতে তাঁর নাম ও শকাব্দ খোদিত আছে। আজও সেই সরোবরটি 'রাণীসায়র' নামে খ্যাত। ১৭২৭ খ্রীস্টাব্দে (১৭৮৪ সম্বৎ) বৃন্দাবন ধামে রাণাপতি ঘাটের পশ্চিমে ইমলিঘাট নির্মাণ করিয়ে দেন। এই বছরেই মথুরায় যমুনা নদীর তীরে প্রসিদ্ধ যে বাঙ্গালীঘাট আছে সেই ঘাট দুটিও ব্রজকিশোরী নির্মাণ করান এবং তার মাথায় শিব প্রতিষ্ঠা করে তার পূজারীর ব্যবস্থা করেন। এই দেবসেবার সমস্ত খরচা বর্ধমান রাজ থেকে বহন করা হয়। বর্তমানে জমিদারি উচ্ছেদের পরের ঘটনা জানা নেই। অম্বিকা কালনায় লালজীউ-এর মন্দির আছে, সেই মন্দিরটি ব্রজকিশোরী ১৭৪১ খ্রী: (১৬৬১ শকাব্দে) বিষ্ণুপুর থেকে স্থপতি আনিয়ে নির্মাণ করান। ২৫ (পঁচিশ) দেউল বিশিষ্ট এই রকম মন্দির সারা ভারতে আর নাই। মন্দিরের গায়ে অসংখ্য টেরাকোটা কাজ দেখলে অবাক হতে হয়। তিনি তৃতীয়বার যখন শ্রীক্ষেত্র জগন্নাথধামে আসেন তখন দেখেন 'মার্কণ্ডেয় সরোবরটি' মজে গেছে। তিনি ওই সরোবরের পঙ্কোদ্ধার করিয়ে তিনটি পাড়ে বড় পাথর বসিয়ে ঘাট তৈরি করিয়ে দেন ১৭৪২ খ্রীস্টাব্দে (১৬৬৩ শকাব্দ)। আজও দেখা যায় ঘাটের শিলালিপিতে ওড়িয়া ভাষায় উৎকীর্ণ আছে ব্রজকিশোরীর নাম। ১৭৪৭ খ্রীস্টাব্দে ব্রজধামের নন্দগ্রামে পুণ্যার্থীদের সুবিধার জন্য পবন সরোবরে

বাঁধাঘাট নির্মাণ করিয়ে দেন এবং ১৭৪৮ খ্রীস্টাব্দে পবন সরোবরের তীরে পবনবিহারী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে মন্দির নির্মাণ করান। ১৭৫৫ খ্রীস্টাব্দে (১৬৭৬ শকাব্দ) অম্বিকা কালনায় তিনি বৈকুণ্ঠনাথ শিব প্রতিষ্ঠা করে অতি মনোরম একটি মন্দির নির্মাণ করিয়ে দেন। ব্রজকিশোরী দেবীর দেব-দেবী ভক্তি ছিল যেমন, তেমনি তিনি গুণগ্রাহী ছিলেন। কালনার শ্রেষ্ঠ কবি প্রাণবল্লভ তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন এবং তাঁরই কথায় 'জাহ্নবীমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন।"[২] এই মন্দির ও ঘাটগুলি নির্মাণের ফলে তা যেমন বিভিন্ন ধর্মীয় কাজে ব্যবহার হয়েছে, তেমনি সাধারণ মানুষ-ও খুব উপকৃত হয়েছেন। মন্দিরগুলি নির্মাণে তাঁর উদ্যোগ প্রশংসনীয়। বিশেষত কালনার লালজীউ মন্দির নির্মাণে বাংলার বিখ্যাত টেরাকোটা শিল্পের কাজ আজও মানুষের মধ্যে বিস্ময়ের প্রকাশ ঘটায়। ঘাটগুলি নির্মাণ করানোর পাশাপাশি সরোবরের সংস্কার করানোর ফলে মানুষের অনেক উপকার হয়। এই দেব সেবা ও সমাজসেবামূলক কর্মের মাধ্যমে রাণীমা সকল মানুষের হৃদয়ে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি নিজের বুদ্ধিমত্তা ও অটল সিদ্ধান্তের জোরে বর্ধমান রাজপরিবারের দায়িত্ব পালন করছেন। ধর্মের প্রতি তাঁর ভক্তি ও জনগণের প্রতি ভালোবাসা তাঁকে অমর করে রেখেছে।

কীর্তিচাঁদ পত্নী রাজরাজেশ্বরী দেবী বর্ধমানের খোসবাগানে রাজরাজেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করেন।
পরবর্তী রাজা চিত্রসেন রায়ের রাণী ছঙ্গকুমারী কালনায় রাজরাজেশ্বর শিব, জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ করান। চিত্রসেনের দ্বিতীয়া রাণী ইন্দ্রকুমারী দেবী প্রতিষ্ঠা করেন ভুবনেশ্বর শিব।

রাণী বিষণকুমারী- রাজা তিলকচাঁদের দ্বিতীয়া স্ত্রী ছিলেন রাণী বিষণকুমারী। তাঁর পিতা ছিলেন মেহেরচাঁদ হাণ্ডে। তিলকচাঁদের মৃত্যুর সময় পুত্র তেজচাঁদের বয়স ছিল মাত্র ৬ বছর। "কাজেই তাঁর গর্ভধারিনী বিষণকুমারী দেবী জমিদারী রক্ষণ করা ব্যাপারে চিন্তা করে ১০,০০০ (দশ হাজার) মুদ্রা নজরানা সহ তেজচাঁদের পিতৃপদের প্রার্থনা জানিয়ে দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের কাছে এলাহাবাদে আবেদন করেন। সেই সময় বাদশাহ এলাহাবাদে ছিলেন। দিল্লীর সম্রাটের ফরমান ছাড়া তিনি রাজা হিসাবে স্বীকৃত হতে পারবেন না। ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শাহ্ আলম, প্রধান সেনাপতি সরাফৎউদ্দৌলা মীর সায়েক-আলি খাঁ-বাহাদুর-মজঃফর জঙ্গ মারফৎ মহারাজ তিলকচাঁদ পুত্র তেজচাঁদকে পাঁচহাজারী জাঠ, তিন হাজার সওয়ার, 'মহারাজাধিরাজ' খেতাব, ঝালদার পাল্কী ও নাকারা প্রদানে ফরমান পাঠিয়ে দেন। তারপর এলাহাবাদ থেকে নবাব মনিরদ্দৌলা বাহাদুর তেজচাঁদকে পরওয়ানা পাঠান।"[৩] এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে, রাণীমা বিচক্ষণতা ও সময়োচিত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বর্ধমান জমিদারীর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন। "রাণী বিষণকুমারী সজ্জন দেওয়ান রূপনারায়ণ চৌধুরীর সহযোগিতায় ও তাঁর অসাধারণ পারদর্শিতায় ও ব্যবস্থাপনায় জমিদারীর কাজ ভালই চলছিল।"[৪] তখন তেজচাঁদ নাবালক থাকায় রাণী বিষণকুমারী সমস্ত দায়িত্বভার নিজ হস্তে নিয়ে নেন ও দক্ষতার সাথে তার পরিচালনা করেন। "তখন বাংলার গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস টাকার লোভে বর্ধমান জমিদারী নিজের অধিকারে কি করে আনা যায় সেই চেষ্টায় ছিলেন।"[৫] কারণ বর্ধমান চাকলার রাজস্বের আয় ছিল সবথেকে বেশি, সেই লোভ হেস্টিংসের তো ছিলই। এছাড়া অপর কারণটি ছিল, বর্ধমান রাজার সাথে ইংরেজদের খুব একটা ভালো সম্পর্ক ছিল না। কারণ ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধে জয়লাভ করে লর্ড ক্লাইভ মহারাজা তিলকচাঁদের নিকট ১০০০ সৈন্য চেয়ে অনুরোধ করেন। কিন্তু মহারাজা ক্লাইভের কোনোরকম অনুরোধ তো রাখলেনই না ও তার ওপর তাঁর অধিকারে থাকা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যাবতীয় বাণিজ্য কুঠীর কাজ বন্ধ করিয়ে দেন। এইসব বিভিন্ন কারণে ওয়ারেন হেস্টিংস বর্ধমানের জমিদারী অধিকার করতে চেয়েছিলেন।

হেস্টিংস যখন বাংলার গভর্নর ছিলেন তখন বর্ধমান জেলার রেসিডেন্ট ছিলেন গ্রাহাম। তিনি ছিলেন হেস্টিংসের বিশেষ পরিচিত। "আর তাঁদের অত্যন্ত অনুগত এই জেলার ধুরন্ধর অর্থলোলুপ এক ব্যক্তি চুপীর ব্রজকিশোর রায়। তাঁরা রূপনারায়ণ চৌধুরীর পরিবর্তে ব্রজকিশোর রায়কে মাসে ১০০০ টাকায় রাজ এস্টেটের

ম্যানেজার নিয়োগ করলেন। কিন্তু অত্যন্ত বুদ্ধিমতী বিষণকুমারী ম্যানেজারের গতিবিধি ও কাজকর্মের দিকে লক্ষ্য রাখতেন। তিনি সরকারী কাগজপত্র দেখে, নিজেই শীলমোহর ছাপ দিতেন। আর ঐ শীলমোহর নিজের জিম্মায় রাখতেন।"[৬] এর মাধ্যমে বোঝা গেল যে রাণীমার উপস্থিত বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও সাহস ছিল প্রবল। নাহলে এমন ধুরন্ধর, অর্থলোলুপ মানুষদের থেকে জমিদারীকে রক্ষা করা সত্যিই কঠিন কাজ ছিল। তাও আবার যে সময়ের কথা আলোচনা করা হয়েছে সেই সময় একজন নারীর পক্ষে এতটা সাহসিকতার সাথে এই কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করা সত্যিই দৃষ্টান্তস্বরূপ। রাণীর এই কাজে ব্রজকিশোর সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়েন। তিনি গ্রাহামের সাথে পরামর্শ করে ৮ বছরের বালক তেজচাঁদকে অন্যত্র সরিয়ে নজরবন্দী করে রাখেন। রাণী তাদের চক্রান্ত বুঝতে পেরে বাধ্য হয়ে শীলমোহরটি ব্রজকিশোরের হাতে দিয়ে তেজচাঁদকে ফিরিয়ে আনেন। এক্ষেত্রে রাণী সময় বিশেষে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজের রাজধর্ম পালনের পাশাপাশি মায়ের কর্তব্য পালন করেন, যা সত্যিই প্রশংসনীয়।

"১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে মহারাণী বিষণকুমারী কাউন্সিলে অভিযোগ আনেন যে, ব্রজকিশোর, রেসিডেন্ট গ্রাহাম ও গভর্নর হেস্টিংসের সম্মতিতে নাবালক পুত্রের আয় ও সম্পত্তির অপচয় করছেন। হেস্টিংসের আপত্তি সত্ত্বেও কাউন্সিল ব্রজকিশোরকে আয় ও ব্যয়ের হিসাব দাখিল করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। অভিযোগে জানা যায় বর্ধমান জমিদারী থেকে ওয়ারেন হেস্টিংস ১৫০০০ (পনের হাজার), সেক্রেটারী কানাইলাল ৫০০০ (পাঁচ হাজার)ও সহকারী কাশীলাল ৫০০ (পাঁচ শত) উৎকোচ গ্রহণ করেছেন এবং রাজকোষের ১১ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছেন যার বেশীর ভাগ অংশ ছিল হেস্টিংস এর প্রাপ্য। এই পরিস্থিতিতে মহারাণী বিষণকুমারী মহারাজ নন্দকুমারের সহায়তায় ব্রজকিশোর রায় ও জন গ্রাহামের বিরুদ্ধে রাজ ধনভাণ্ডার তছরূপের অভিযোগ দায়ের করে সরাসরি কাউন্সিলে আবেদন করেন। গভর্নর হেস্টিংসের এ ছিল ধারণার বাইরে। তিনি শিলমোহর ফেরৎ দেওয়ার জন্য ব্রজকিশোরকে নির্দেশ দেন। ফলে চক্রান্তকারীরা মহারাণীর রূপযৌবনের প্রতি কটাক্ষ করে নানাপ্রকার কুৎসা রটনা করে। মহারাণী এইসব রটনার প্রতিবাদ জানিয়ে পুনরায় কাউন্সিলে আবেদন করেন। ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে হেস্টিংসের বিচারের সময় বর্ধমানের অভিযোগও উত্থাপিত হয়েছিল। কাউন্সিলের নির্দেশে এগারো বছরের মহারাজা তেজচাঁদ, মহারাণী বিষণকুমারীকে খেলাত দেওয়া হয়।"[৭] এর মাধ্যমে বোঝা যায় রাণীর অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই সমস্যার সমাধানের পাশাপাশি নিজের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখেন।

পরবর্তীতে জানা যায় যে, কাউন্সিল ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রজকিশোরকে বরখাস্ত করে জমিদারীর দায়িত্ব অর্পণ করেন মহারাণী বিষণকুমারীকে। রাণী রাধানগর গ্রামের পণ্ডিত ব্যক্তি রামকান্ত রায়কে দেওয়ান নিযুক্ত করেন। এরপর নানা ঘটনা পরম্পরায় শেষ পর্যন্ত রামকান্ত রায় কাজে ইস্তফা দিয়ে গ্রামে ফিরে যান। মহারাণী ১৬ বছরের মহারাজ তেজচাঁদকে জমিদারীর সব দায়িত্ব অর্পণ করে কালনায় গিয়ে বাস করেন। এদিকে বিলাসব্যসনে ও স্বার্থান্বেষী মানুষের প্রভাবে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। ফলে রাজস্ব ফাঁকি পড়ে যায়। মহারাজকে নজরবন্দী করে রাখা হয়। বোর্ডের নির্দেশে বকেয়া রাজস্ব আদায়ের শর্তে রাণী বিষণকুমারী পুনরায় জমিদারীর দায়িত্ব নিলেন। রাণী বাকি খাজনা কিস্তিতে ও নিজ সঞ্চিত অর্থ এবং ইংরেজদের অনুমতিতে কিছু নিষ্কর জমি বিক্রি করে বকেয়া রাজস্ব পরিশোধ করেন। এইসব বিভিন্ন ঘটনার দ্বারা রাণী বিষণকুমারী দেবীর দৃঢ়তা, সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ, পুত্রের প্রতি দায়িত্ব, বর্ধমানের জমিদারীর প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালন প্রভৃতি তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে।

"মহারাণী বিষণকুমারী কালনায় ১৭৬৪ খ্রীঃ কামনায় মহাবিষ্ণু মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কালনায় শিব প্রতিষ্টা করান। তারপর তাঁর উল্লেখযোগ্য দেবকীর্তি হলো বর্ধমানের নবাবহাটে ১০৮ এবং ১ শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা। এই শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন বর্ধমান রাজ আশ্রিত তারকেশ্বরের দশনামী শৈব

সম্প্রদায়ের সাধুগণ। এই তাঁর জীবনের ছিল শেষ কীর্তি।"[৮] রাণী বিষণকুমারী ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর দেহত্যাগ করেন। কালনায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। রাণীমা নিজ বিচক্ষণতা, দূরদর্শীতা, সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে বর্ধমান রাজপরিবারের গৌরব বৃদ্ধি করেন। প্রশাসন পরিচালনার পাশাপাশি তিনি দেবসেবার দ্বারা ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখেন। জনকল্যাণমূলক নানা কাজের মাধ্যমে তিনি আজও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

পরবর্তী রাজা তেজচাঁদের পত্নী মহারাণী কমলকুমারীর ইচ্ছায় মহারাজ তেজচাঁদ নূতনগঞ্জ মহল্লায় ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রী শ্রী রাধাবল্লভ জীউ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে দুই তলার ঠাকুর ঘর, নাট্যমঞ্চ নির্মাণ করানো হয়। আর নাটমঞ্চের চারদিকে অনেকগুলি ঘর, পূজারীর থাকার ঘর, পূজার বিভিন্ন সামগ্রী রাখার ঘর তৈরী করানো হয়। নাটমঞ্চে নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান, কৃষ্ণযাত্রা পালাগান হতো। দুই তলার ওপরের ঘরের জানালা থেকে বাড়ির নারীগণ অনুষ্ঠান দেখতেন।

"তখনকার দিনে পানীয় জলের এমন সুব্যবস্থা ছিল না, সাধারণের জন্য পুকুরই ছিল ভরসা। গোলাপবাগের পশ্চিমাঞ্চল ছিল মুসলমান বসতি এলাকা। এখানে জলের সুব্যবস্থা ছিল না। ১৮১২ খ্রীস্টাব্দে মহারাজ তেজচন্দ্র তাঁর পঞ্চমা মহিষী কমলকুমারীর নামে 'কমলসায়র' খনন করান এবং বাঁধাঘাট নির্মাণ করান।"[৯] আজও এই সায়রটি আছে এবং এই সায়রটিকে কেন্দ্র করে চারপাশে অনেক বাড়ি, ব্যবসায়িক কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে। সর্বোপরি এই সায়রের পাশেই নির্মাণ করা হয়েছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি। এই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়তে আসেন।

"১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ তেজচাঁদের পত্নী কমলকুমারী রাজবাড়ির ভিতরে মেয়েদের যে পাঠশালাটি শুরু করেছিলেন, ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে অন্তঃপুরের সেই অঙ্কুরটিকে বহির্বিশ্বের আলোকে এনে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিলেন মহাতাব চন্দ। কমলকুমারীর স্মৃতিতে নামাঙ্কিত 'মহারাণী অধিরাণী বালিকা বিদ্যালয়'টি সর্বপ্রাচীন বালিকা বিদ্যালয়রূপে বর্ধমান শহরের বুকে আজও উজ্জ্বল।"[১০] কমলকুমারী দেবীর এই উদ্যোগ সত্যিই প্রশসংনীয়। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে মেয়েদের সাংসারিক কাজকর্মের পাশাপাশি বিদ্যা অর্জন করা কতটা আবশ্যিক। তাই তিনি রাজবাড়ির অভ্যন্তরে মেয়েদের শিক্ষা অর্জনের বিষয়ে উদ্যোগ নেন। আর তাঁর ও পরবর্তীতে মহারাজা মহাতাব চাঁদের এই উদ্যোগের কারণেই বর্ধমানের মেয়েরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পায়, যা বর্ধমানের নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য দিক। আজ বর্ধমানের মেয়েরা পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী। উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্য আজ তাঁরা দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ও বিদেশেও পাড়ি দিচ্ছে। এই শিক্ষাই তাঁদের জীবনকে নতুন ভাবে গড়তে, নতুন ভাবে ভাবতে শিখিয়েছে। আমরা বর্ধমানের মেয়েরা আজ অন্তর হতে রাণী কমলকুমারী দেবী ও মহারাজা মহাতাব চাঁদকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

মহারাজা মহতাবচাঁদের কন্যা ধনদেয়ী দেবী ধনেশ্বরী দেবী ঠাকুরবাড়ি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি "শ্রীশ্রীধনদেয়ীদেবী ট্রাস্ট কমিটি" নামে একটি ট্রাস্ট কমিটি গঠন করেন।

মহারাজা মহতাবচাঁদের পত্নী নারায়ণকুমারী দেবী ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে ভুবনেশ্বরী সোনার কালীবাড়ি ও নারায়ণেশ্বর শিবমন্দির নির্মাণ করান। এখানে কালীপ্রতিমাটি স্বর্ণের।

রাজা বনবিহারী কাপূরের কনিষ্ঠা কন্যা শক্তিদেয়ী দেবী মহাতাব মঞ্জিলের দক্ষিণে শক্তিবিবি ঠাকুরবাড়ি নির্মাণ করান। এখানে গোপাল জিউ ও রাধারমন জিউ-এর মূর্তি অধিষ্ঠিত আছে।

মহারাজা প্রতাপচাঁদের স্ত্রী প্যারীকুমারী স্বামীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে কালনায় রাজবাড়ির চত্বরে নির্মাণ করান প্রতাপেশ্বর শিব মন্দির। এই মন্দিরটি ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর রেখ দেউলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। মন্দিরের দেওয়ালে বাংলার বিখ্যাত টেরাকোটা শিল্প বা পোড়ামাটির কাজ সত্যিই অসাধারণ।

রাজপরিবারের রাণীগণ যেমন ছিলেন প্রশাসন পরিচালনার পাশাপাশি ধর্মানুরাগী, প্রজাবৎসল, সাহসী তেমনি এই রাজপরিবারের কন্যাদের মধ্যে ধর্মনিষ্ঠার সাথে ছিল আত্মবিশ্বাস ও অসীম সাহসিকতা। রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের মৃত্যুর পর চেতুয়া বরদার জমিদার শোভা সিং-এর নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা বর্ধমান শহর আক্রমণ করেন। কৃষ্ণরাম রায়ের ছয় পত্নী ও তাঁদের পরিচারিকাগণ নিজেদের সম্ভ্রম রক্ষা করতে বিষপান করে প্রাণ বিসর্জন দেন। এরপর শোভা সিং কৃষ্ণরাম রায়ের কন্যা সত্যবতীর কক্ষে প্রবেশ করে তাঁর ওপর অত্যাচারের উপক্রম করলে সত্যবতী নিজ খোঁপার মধ্যে লুকিয়ে রাখা ছুরি দিয়ে শোভা সিং-কে হত্যা করেন। এইভাবে অসীম সাহসিকতার মাধ্যমে বীরাঙ্গনা নিজের সম্মান ও প্রাণ রক্ষা করেন। বর্ধমান রাজপরিবারের নারীর এই অসীম সাহসিকতা দৃষ্টান্ত সত্যিই অনন্য। এই কঠিন পরিস্থিতিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বা আত্মহননের পথ বেছে না নিয়ে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ রাজকুমারী সত্যবতী। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে তিনি শুধু নিজেকেই রক্ষা করেন নি, তিনি বর্ধমান রাজপরিবারকেও রক্ষা করেন। কারণ শোভা সিং-এর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই হিম্মত সিং বিদ্রোহীদের নেতা হন। কিন্তু তিনি নামেই নেতা ছিলেন তাঁর কোনো প্রভাব বর্ধমান রাজপরিবারের ওপর পড়ে নাই।

রাণী রাধারাণী মহাতাব-বর্ধমানের শেষ স্বাধীন শাসক মহারাজা উদয়চাঁদ মহাভাবের স্ত্রী ছিলেন রাধারাণী দেবী। পারিবারিক তথ্য অনুসারে রাধারাণী মহাতাবের জন্ম হয় ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে আগস্ট পাঞ্জাবের এক টেক্সটাইল ব্যবসার সাথে নিযুক্ত পরিবারে। তাঁর পিতার নাম রায়বাহাদুর দুলীচাঁদ মেহেরা। বর্ধমান রাজপরিবারের অন্যান্য নারীদের ন্যায় রাধারাণী দেবীও শিক্ষা, দান-ধ্যান প্রভৃতি সমাজসেবামূলক কর্মের সাথে যুক্ত ছিলেন। রাজরানী হওয়ার পাশাপাশি তাঁর অপর একটি পরিচয়। তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের কারা ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের উপমন্ত্রী। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের অনুরোধে তিনি ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী হন এবং জয়লাভ করেন। তিনি ছিলেন খুব প্রাণোচ্ছল ও জনদরদী মানুষ। পরিবারের সকল সদস্য, নিজ পুত্র-কন্যাদের সাথে ছিল তাঁর খুব ভালো সম্পর্ক। নির্বাচনের সময় প্রচারে গিয়ে সাধারণ মানুষের সাথে খুব সহজেই তিনি এক হয়ে গিয়েছিলেন। "বর্ধমানের সাধারণ মানুষ দেখলেন একজন রানী শহর এবং গ্রামের মানুষের কাছে যাচ্ছেন, তাদের বাড়ির মহিলাদের সঙ্গে কথা বলছেন, বাচ্চাদের আদর করছেন, এমন কী শহরের রিক্সাওয়ালাদের পল্লিতেও যাচ্ছেন, রাস্তায় দাঁড়িয়ে সভা করছেন, মানুষের সাথে মিশে যাচ্ছেন।"[১১] জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে বর্ধমান হাসপাতালে "রাধারাণী ব্লক" নামে আরো একটি অংশ নির্মাণ করান। তিনি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের অনুমতি নিয়ে এই বিভাগ নির্মাণ করান। তবে এই অংশের সম্পূর্ণ কাজ তাঁর মৃত্যুর পর সমাপ্ত হয়। মন্ত্রী হিসাবে তিনি কলকাতায় মহাকরণে নিয়মিত যেতেন। তিনি আরো অনেক জনকল্যাণমূলক কার্যে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি বর্ধমানের নারীদের কাছে হয়ে ওঠেন দৃষ্টান্তস্বরূপ। একজন রাণী রাজঅন্তঃপুরে না থেকে সমাজের কল্যাণের উদ্দেশ্যে নিজের নিয়োজিত করেন। তিনি সকলের কাছে হয়ে ওঠেন আদর্শ। তবে তিনি বেশিদিন মন্ত্রীত্ব পদে বহাল থাকতে পারেন নাই। রোগাক্রান্ত হয়ে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ জুন কলকাতার উডল্যাণ্ডস নার্সিংহোমে রাধারাণী দেবী দেহত্যাগ করেন। তাঁকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদার সাথে বিদায় জানানো হয়। রাণীমার সম্মানার্থে তাঁর নামানুসারে বর্ধমান শহরের ভাতছালায় রাধারাণী স্টেডিয়াম নির্মিত হয়েছে। ইহা বর্ধমানের প্রথম স্টেডিয়াম। এখানে ক্রিকেট, ফুটবল ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলা হয়ে থাকে।

উপসংহার:

ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাতায় বর্ধমান রাজপরিবারের রাণীদের ও রাজকুমারীদের ভূমিকা এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। তাঁরা রাজবাড়ির অন্তঃপুরে স্বামী, পুত্রের প্রতি কর্তব্য পালনের সাথে সংসার জীবন যেমন অতি নিষ্ঠার সাথে পালন করেছিলেন, তেমনি সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশাসন, সমাজসংস্কার, ধর্মীয় কার্যকলাপ ও জনকল্যাণমূলক কাজেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রাণী ব্রজকিশোরী দেবীর দৃঢ়তা ও ধর্মনিষ্ঠা, রাণী বিষণকুমারীর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও প্রশাসনিক দক্ষতা এবং রাণী রাধারাণী মহাতাবের আধুনিক রাজনৈতিক সচেতনতা ও জনসেবামূলক মানসিকতা নারীশক্তির এক অপূর্ব দ্যুতির প্রকাশ ঘটিয়েছে। এই তেজস্বী নারীদের কীর্তি বর্ধমানের ইতিহাসকে বহুল পরিমাণে সমৃদ্ধ করেছে। এই নারীদের সমাজকল্যাণের কাহিনী প্রমাণ করে যে, নারীশক্তি কেবল পারিবারিক গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, উপযুক্ত সুযোগ ও আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে তাঁরা বৃহত্তর সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এই নারীরা তাঁদের সময়ের সামাজিক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে নেতৃত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তাঁরা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পরিচালনার পাশাপাশি শিক্ষা বিস্তার, দরিদ্রের সেবা এবং জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের নির্মিত মন্দির, ঘাট, দানধ্যান এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপ আজও ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। তাই বলা যায় যে, বর্ধমান রাজপরিবারের রাণী ও রাজকুমারীগণের জীবন ও কর্ম শুধু আঞ্চলিক ইতিহাসের অংশ নয়, বরং সমগ্র বাংলা তথা সমগ্র ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে নারীর ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্বের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। দেবসেবা ও জনকল্যাণে বর্ধমানের রাণী ও রাজকুমারীগণের কৃতিত্ব ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যেমন অনুপ্রাণিত করবে এবং তেমনি ইতিহাসচর্চায় এক গুরুত্বপূর্ণ দিক উন্মোচন করবে। এরফলে বর্ধমানের ইতিহাস আরো বহুল পরিমাণে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। আজও আমরা সমগ্র বর্ধমানবাসী এই মহীয়সী নারীগণকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।

তথ্যসূত্র:

১. সরকার, নীরদবরণ। বর্ধমান রাজ। বিনয় প্রকাশনী, ২০১৬, বর্ধমান, পৃ. ৩০।
২. তদেব, পৃ. ৩০ ও ৩১।
৩. তদেব, পৃ. ৩৮।
৪. তদেব, পৃ. ৩৮।
৫. তদেব, পৃ. ৩৮।
৬. তদেব, পৃ. ৩৯।
৭. তদেব, পৃ. ৩৯।
৮. তদেব, পৃ. ৪০।
৯. তদেব, পৃ. ৪৭।
১০. নাসরীন, সৈয়দ তানভীর। মেয়েদের লেখাপড়া ও শহর বর্ধমান । বর্ধমান ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব চর্চা কেন্দ্র,২০১১, বংশগোপাল টাউন হল, বর্ধমান, পৃ. ৮৩।
১১. কোঙার, গোপীনাথ। রানি থেকে মন্ত্রী: বর্ধমানের মহারানি রাধারানি মহাতাব। বর্ধমান ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব চর্চা কেন্দ্র, ২০১১, বংশগোপাল টাউন হল, বর্ধমান, পৃ. ৩১।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. কোঙার, ড. গোপীকান্ত। বর্ধমান (এক ঝলকে পর্যটন)। বর্ধমান: ইন্দু পাবলিকেশনস্, ২০০৩।
২. সরকার, নীরদবরণ। কীর্তিচাঁদের কীর্তি। বর্ধমান: বিনয় প্রকাশনী, ২০১৬।
৩. যশ, সর্বজিৎ। বর্ধমান জেলার নারী ইতিহাসের সন্ধানে। বর্ধমান ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব চর্চা কেন্দ্র, বংশগোপাল টাউন হল, বর্ধমান, ২০১১।